প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা

৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক মজার ব্যাপার হল। আমি কাল সকালে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় চাকর প্রহ্লাদ এসে খবর দিল যে একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে লোক জিজ্ঞেস করতে প্রহ্লাদ মাথা চুলকে বলল 'আজ্ঞে, সে তো নাম বলেনি বাবু। তবে আপনার কাছে সচরাচর য্যামন লোক আসে ঠিক তেমনটি নয়।'

আমি বললাম, 'দেখা না করলেই নয় ? বড় ব্যস্ত আছি যে।'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে, বলতেছেন বিশেষ জরুরি দরকার। না দেখা করি যাইতে চায়েন না।'

কী আর করি, কাজ বন্ধ করেই যেতে হল।

গিয়ে দেখি একটি অতি গোবেচারা সাধারণ গোছের ভদ্রলোক, বছর ত্রিশেক বয়েস, পরনে ময়লা খাটো ধুতি, হাতকাটা সার্টের চারটে বোতামের দুটো নেই, মুখে তিনদিনের দাড়ি, হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন তো বড় ভাল হয়।'

আমি বললাম, 'কেন বলুন তো ? আমি তো এখন বিশেষ ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক যেন আরও খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কার কাছে যাব বলুন। আমি থাকি ঝাঝায়। আমার ছেলেটার ব্যারাম—কী যে ব্যারাম তা বুঝতেও পারছি না। আপনি হলেন এ মুল্লুকের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, তাই আপনার কাছেই—'

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার একটু ভুল হয়েছে। আমি ডাক্তার নই, বৈজ্ঞানিক।'

ভদ্রলোক একেবারে যেন চুপসে গেলেন।

'ভুল হয়েছে ? বৈজ্ঞানিক ! ও, তা হলে বোধ হয় ভুলই হয়েছে। কিন্তু তা হলে কোথায় যাব বলুন তো ?'

'কেন, আপনাদের ওদিকে তো আরও অন্য ডাক্তার রয়েছেন।'

'তা আছে। তবে তারাও কিছু করতে পারল না আমার খোকার জন্য।'

'কী হয়েছে আপনার ছেলের ? কত বয়স ?'

'আজ্ঞে, ছেলের আমার চার পুরেছে গত জষ্ঠি মাসে। খোকা বলে ডাকি, ভাল নাম

অমূল্য। হয়েছে কী—এই সেদিন—এই গত বুধবার সকালে—আমার উঠোনের এক কোণে শেওলা ধরে ভারী পেছল হয়ে আছে—সেখানে খেলা করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথার এই বাঁ দিকটায় একটা চোট লাগল। খুব কান্নাকাটি করল খানিকটা। পরে দেখলাম মাথার ওইখানটা ফুলেওছে বেশ। ফোলা অবিশ্যি দুদিনেই কমে গেল, কিন্তু সে থেকে কী যে আবোলতাবোল বকছে তা বুঝতেই পারছি না। অমন কথা সে এর আগে কক্ষনও বলেনি বাবু! তবে কেমন যেন মনে হয়—বুঝতে পারি না—তবু মনে হয়—সে কথার যেন মানে আছে। তবে আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—পোস্টাপিসের কেরানি—আমরা তার মানে বুঝি না।'

'ডাক্তার বোঝেনি তার মানে?'

'আজ্ঞে না। আর সে ডাক্তার তো তেমন নয়, তাই ভাবলাম যে আপনার কাছে...।'

আমি বললাম, 'কেন, ঝাঝার ডাক্তার গুহ মজুমদারকে তো আমি চিনি। তিনি তো ভাল চিকিৎসক।'

তাতে ভদ্রলোক খুব কাতরভাবে বললেন, 'আমার কি তেমন সামর্থ্য আছে বাবু যে আমি বড় ডাক্তারকে ডাকব! আমায় সবাই বললে যে গিরিডির শঙ্কু ডাক্তারের কাছে যাও—তিনি দয়ালু লোক বিনি পয়সায় তোমার ছেলেকে ভাল করে দেবেন। তাই এলুম আর কী।'

লোকটিকে দেখে মায়া হচ্ছিল, তাই আমার ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে দিয়ে বললাম, 'আপনি গুহ মজুমদারকে দেখান। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে ভাল করে দেবেন।'

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞভাবে টাকাটা পকেটে পুরে হাত জোড় করে মাথা হেঁট করে বললেন, 'আসি তা হলে। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম—মাফ করবেন।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এলাম। এরা আমাকে ডাক্তার বলে ভুল করল কী করে, সেটা ভেবে যেমন হাসি পাচ্ছে, তেমন অবাকও লাগছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার চিরকালের অভ্যাস। উঠে হাত মুখ ধুয়ে একটু উত্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে দেখি ঝাঝার ডাক্তার প্রতুল গুহ মজুমদার ও সেদিনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমি তো অবাক। প্রতুলবাবু এমনিতে বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ দেখলাম তিনি রীতিমতো গম্ভীর ও চিন্তিত। আমাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি তো মশাই বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, এ চিকিৎসা তো আমার দ্বারা সম্ভব নয় প্রোফেসর শঙ্কু!'

আমি প্রহ্লাদকে ডেকে কফি আনতে বলে সোফায় বসে প্রতুলবাবুকে বললাম, 'কী অসুখ হয়েছে বলুন তো ছেলেটির। কষ্টটা কী?'

'কোনও কষ্ট আছে বলে মনে হয় না।'

'তবে? মাথায় চোট লেগে ব্রেনে কিছু হয়েছে কি? ভুল বকছে?'

'বকছে, তবে ভুল-ঠিক বলা শক্ত। এখন পর্যন্ত এমন কিছু বলতে শুনিনি যেটাকে জোর দিয়ে ভুল বলা চলে। আবার এমন কিছু বলতে শুনেছি যেগুলো একেবারে অবিশ্বাস্য রকম ঠিক।'

'কিন্তু আমিই বা এ ব্যাপারে কী করতে পারি বলুন।'

প্রতুলবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটি পরস্পরের দিকে চাইলেন। তারপর প্রতুলবাবু বললেন, 'আপনি একবার আমাদের সঙ্গে চলুন ! আমার গাড়ি আছে—একবার দেখে আসুন অন্তত। আমার মনে হয়—আর কিছু না হোক আপনার খুব আশ্চর্য ও ইন্টারেস্টিং লাগবে। সত্যি বলতে কী, কেউ যদি এর একটা কিনারা করতে পারে, তবে সেটা আপনিই পারবেন।'

খুব একটা জরুরি কারণ না থাকলে প্রতুলবাবু আমাকে এমন অনুরোধ করতেন না সেটা জানি। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গ নিতেই হল। ফিয়াট গাড়িতে করে গিরিডি থেকে ঝাঝা পৌঁছোতে আমাদের লাগল দু'ঘণ্টা।

পথে আসতে আসতেই জেনেছিলাম অন্য ভদ্রলোকটির নাম দয়ারাম বোস। সাত বছর হল ঝাঝার পোস্টাপিসে চাকরি করছেন। বাড়িতে স্ত্রী আছেন, আর ওই একটি মাত্র ছেলে অমূল্য ওরফে খোকা। বাড়িটাও দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে মানানসই। খোলার ছাতওয়ালা একতলা বাড়ি, দুটি মাত্র ঘর, আর একটা আট হাত বাই দশ হাত উঠোন—যে উঠোনে খোকা পিছলে পড়েছিল। পুব দিকে ঘরের একটা ছোট্ট খাটের উপর বালিশে মাথা দিয়ে 'খোকা' শুয়ে আছে। রোগা শরীর, মাথাটা আর চোখ দুটো বড়, চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খোকা বলল, 'স্বাগতম্।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তুমি সংস্কৃতে অভ্যর্থনা জানাতে শিখলে কী করে ?'

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে খোকা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সিক্স অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ ?'

পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণ—কিন্তু এ প্রশ্নের মানে কী ?

আমি দয়ারামবাবুর দিকে চেয়ে বললাম, 'এসব কথা ও কোত্থেকে শিখল ?'

দয়ারামের বদলে প্রতুলবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'যা বুঝছি ও যে সমস্ত কথা কদিন থেকে বলছে, তা ওকে কেউ শেখায়নি। ও নিজে থেকেই বলছে। সেইখানেই তো গণ্ডগোল। অথচ খাচ্ছেদাচ্ছে ঠিকই। ঘুমটা বোধ হয় একটু কমেছে। আমরা যখন বেরিয়েছি পাঁচটায় তখনই ও উঠে গিয়ে কথা শুরু করেছে।'

আমি বললাম, 'সকালে কী বলছিল ?'

এ প্রশ্নের উত্তর খোকা নিজেই দিল। সে বলল, 'করভাস্ স্প্লেন্ডেন্, পাসের ডোমেস্টিকাস্।'

আমার পিছনেই একটা চেয়ার ছিল ; আমি সেটায় ধপ্ করে বসে পড়লাম। এ যে আমাদের অতি পরিচিত সব পাখির ল্যাটিন নামগুলো বলছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে যে সব পাখিকে প্রথম ডাকতে শুনি সেগুলোরই ল্যাটিন নাম হল এই দুটো। করভাস্ স্প্লেন্ডেন হল কাক আর পাসের ডোমেস্টিকাস্ হল চড়াই।

এবারে আমি খোকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে এসব নামগুলো কে শেখালে বলতে পার ?'

কোনও উত্তর নেই। সে একদৃষ্টে একটা দেয়ালের টিকটিকির দিকে চেয়ে রয়েছে। এবার বললাম, 'একটুক্ষণ আগে আমাকে দেখে যে কথাটা বললে সেটা কী ?'

'সিক্স, অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেটার—'

কথা শেষ করলাম না, কারণ আমার হঠাৎ খেয়াল হল আমার চশমার দুটো লেন্সের পাওয়ার হল মাইনাস সিক্স ও মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ !

এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর আমার জীবনে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

boiyomanjusha.blogspot.com

এবার বিছানার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে খোকার উপর একটু ঝুঁকে পড়ে প্রতুলবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যথাটা মাথার ঠিক কোনখানটায় লেগেছিল বলুন তো ?'

প্রতুলডাক্তারের মুখ খোলার আগেই খোকাই জবাব দিল, 'অস্ টেম্পোরালে।'

নাঃ, একেবারে অবিশ্বাস্য অভাবনীয় ব্যাপার। মাথার হাড়ের ডাক্তারি নামও জেনে ফেলেছে এই সাড়ে চার বছরের ছেলে।

আমি ঠিক করলাম খোকাকে আমার বাড়িতে এনে কয়েকদিন রাখব, তাকে পর্যবেক্ষণ করব, পরীক্ষা করব। মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে অনেক কিছু স্টাডি করা হয়তো এ থেকে সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার হয়তো অনেক উপকারও হবে।

দয়ারাম ও প্রতুলবাবু দুজনেই আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। খোকার মা কেবল বললেন, 'আপনি ওকে নিয়ে যেতে চান তো নিয়ে যান, কিন্তু দয়া করে ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটি করে আমাদের আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। চার বছরের ছেলের চার বছরের বুদ্ধিই ভাল। ও যা কথা বলছে আজকাল, সে তো আর আমাদের সঙ্গে নয়, সে ওর নিজের সঙ্গে। আমরা ওর কথা বুঝিই না ! ছেলে যেন আর আমাদের ছেলেই নেই। এতে মনে বড় কষ্ট পাই, ডাক্তারবাবু। আমার ওই একমাত্র ছেলে, তাই আমাদের কথাটাও একটু ভেবে দেখবেন !'

এ রোগের ওষুধ আমারও জানা নেই তবে আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মাথা খাটিয়ে চেষ্টা করলে এর একটা চিকিৎসা বার করা সম্ভব নয়—সেটাই বা ভাবি কী করে ? তবে মুশকিল হয়েছে কী, খোকার যে জিনিসটা হয়েছে সেটাকে ব্যারাম বলা চলে কি না সেখানেই সন্দেহ। তবু বুঝতে পারি ছেলে বেশি বদলে গেলে বাপমায়ের কখনও ভাল লাগে না—বিশেষ করে রাতারাতি বদলালে তো কথাই নেই।

ঝাঝা ছাড়লাম প্রায় দুপুর সাড়ে এগারোটায়। প্রতুলবাবুই পৌঁছে দিলেন। পথে সাতাশ মাইলের মাথায় গাড়িটা হঠাৎ একটু বিগড়ে থেমে গিয়েছিল, তাতে খোকা শুধু একবার বলে, 'স্পার্কিং প্লাগ'। বনেট খুলে দেখা যায় স্পার্কিং প্লাগেই গণ্ডগোলটা হচ্ছে, এবং সেটা ঠিক করাতেই গাড়িটা চলে। এ ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি, বা খোকাও কোনও কথা বলেনি।

কাল থেকেই খোকা আমার এখানে আছে। আমার দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় ওকে রেখেছি ! দিব্যি নিশ্চিন্তে আছে। বাড়ির কথা বা মাবাবার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। আমার বেড়ালের নাম নিউটন শুনে খোকা খালি বলল 'গ্র্যাভিটি'। বুঝলাম স্যার আইজ্যাক নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন সেটাও খোকা কী করে জানি জেনে ফেলেছে।

বেশিরভাগ সময় খোকা চুপচাপ খাটেই শুয়ে থাকে, আর কী জানি ভাবে। আমার চাকর প্রহ্লাদ তো ওকে পেয়ে ভারী খুশি। আমি যেটুকু সময় ঘরে থাকি না, সে সময়টুকু প্রহ্লাদ ওর কাছে থাকে। তবে খোকার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা চলে না এইটেতেই তার দুঃখ। আমার কাছে তাই নিয়ে আপশোস করাতে আমি বললাম, 'কিছুদিন এখানে থাকতে আশা করছি ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।' কথাটা বলেই অবিশ্যি মনে হল যে সেটা সত্যি হবে কি না আমার জানা নেই।

খোকার মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা হয় তার জন্য দুটো নাগাদ ওকে একটা ঘুম পাড়ানো বড়ি দুধে গুলে খেতে দিয়েছিলাম ! খোকা গেলাসটা হাতে নিয়েই বলল, 'সন্নোলিন।' অথচ দুধটা দেখে বা শুঁকে ওষুধের অস্তিত্বটা টের পাবার কোনও উপায় নেই। এদিকে আমি তো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ধরা যখন পড়েই গিয়েছি, তখন সেটা স্বীকার করেই বললাম,

'তোমার ঘুমোলে ভাল হবে। ওটা খেয়ে নাও।'

খোকা শান্ত স্বরে বলল, 'না, ওষুধ দিও না। ভুল কোরো না।'

আমি বললাম, 'তুমি কী করে জানলে আমি ভুল করেছি? তোমার কী হয়েছে তুমি জান?'

খোকা চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তোমার কি কোনও অসুখ করেছে? সে অসুখের নাম তুমি জান?'

খোকা কোনও কথা বলল না। এ প্রশ্নের উত্তর কোনওদিন তার কাছে পাওয়া যাবে কি না জানি না। দেখি বইপত্তর ঘেঁটে যদি কোনও কূলকিনারা করতে পারি।

আজ সকাল থেকে খোকার কথা ও জ্ঞানের পরিধি অসম্ভব বেড়ে গেছে।

কাল সারাদিন নানান ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক বই ঘেঁটেও খোকার এই অদ্ভুত 'ব্যারাম' সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। দুপুরবেলা আমার দোতলার স্টাডিতে বসে জুলিয়াস রেডেলের লেখা মস্তিষ্কের ব্যারামের উপর বিরাট মোটা বইটা একমনে পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ খোকার গলা কানে এল—'ওতে পাবে না।'

আমি অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি সে কখন জানি তার ঘর থেকে উঠে চলে এসেছে। এর আগে এখানে এসে অবধি সে তার নিজের ঘরের বাইরে কোথাও যায়নি, বা যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম। খোকার কথার মধ্যে এমন একটা স্থির বিশ্বাসের সুর, যে সেটা অগ্রাহ্য করার কোনও উপায় নেই। একজন ষাট বছর বয়সের বুদ্ধিমান বুড়ো যদি আমায় এসে গম্ভীর ভাবে বলত রেডেলের বইয়ে কোনও একটা জিনিস নেই, আমি হয়তো তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস নাও করতে পারতাম। কিন্তু সাড়ে চার বছরের খোকার কথায় আমার হাতের বইটা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

খোকা কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'টিয়্যানিয়াম্ ফসফেট।'

আশ্চর্য! একতলায় আমার ল্যাবরেটরিতে রাখা আমার তৈরি নতুন অ্যাসিডের নাম খোকা জানল কী করে। আমি বললাম, 'ভারী কড়া অ্যাসিড!'

খোকার মুখে যেন এই প্রথম একটু হাসির আভাস দেখলাম। সে বলল, 'ল্যাবরেটরি দেখব।'

এই সেরেছে। ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই আমার। এ অবস্থায় ওকে ওই সব কড়া কড়া অ্যাসিড, গ্যাস ইত্যাদির মধ্যে নিয়ে গেলে যে কখন কী করে বসবে তার কি ঠিক আছে? আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওখানে গিয়ে কী হবে?—ধুলো, তা ছাড়া গন্ধও ভাল নয়। নানারকম আজেবাজে ওষুধপত্র।'

খোকা কিছু না বলে আবার পায়চারি শুরু করল। আমার টেবিলের উপর একটা গ্লোব ছিল, সেটা সে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। গ্লোবটায় সাউথ আমেরিকার একটা জায়গায় খানিকটা রং চটে গিয়েছিল, ফলে কিছু জায়গার নাম চিরকালের মতো সেটা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। খোকা কিছুক্ষণ সেই ছোট্ট রং ওঠা জায়গাটার দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আমার টেবিলের উপর থেকে ফাউন্টেন পেন তুলে খুদে খুদে অক্ষরে সেই জায়গাটায় কী জানি লিখল। শেষ হলে পর গ্লোবটার উপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম লিখেছে Serinha, Jacobina, Campo, Formosa। এই ক'টি নামই গ্লোবটা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে নিয়ে আজ সারাদিন খোকা যে কত কী বলেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

আইনস্টাইনের ইকুয়েশন, আমার নিজের পোলার রিপলেয়ন থিয়োরি, চাঁদে কোন উপত্যকা সব চেয়ে বড়, কোন পাহাড় সব চেয়ে উঁচু, বুধগ্রহের আবহাওয়ায় কেন এত কার্বনডায়ক্সাইড, এমনকী আমার ঘরের বাতাসে কী কী জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ সবই খোকা আউড়ে গেছে। এর ফাঁকে একটা আস্ত মাদ্রাজি গান গেয়েছে ও হ্যামলেট থেকে 'টু বি অর নট টু বি' আবৃত্তি করেছে। বিকেল চারটে নাগাদ আমি আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম, প্রহ্লাদ খোকার কাছে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সেই ফাঁকে খোকা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদ ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তারপর আমরা দুজনে নীচে গিয়ে দেখি সে আমার ল্যাবরেটরির তালা দেওয়া দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছে।

আমি অবিশ্যি তাকে ধমকটমক কিছুই দিলাম না, কেবল ওর হাতটা ধরে বললাম, 'চলো, আমরা পাশের বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।' সে অমনি বাধ্য ছেলের মতো আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় সোফায় গিয়ে বসল, আর ঠিক সেই সময়ই এসে পড়লেন আমার পড়শি অবিনাশবাবু।

তাঁর আবির্ভাবটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল না, কারণ অবিনাশবাবু ভারী গপ্পে মানুষ ; খোকাকে দেখে এবং তার কীর্তিকলাপ শুনে যদি আর পাঁচজনের কাছে গল্প করেন তা হলে আর রক্ষে নেই। আমার বাড়িতে দেখতে দেখতে মেলা বসে যাবে, আর সেই মেলার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হবে খোকা।

বলা বাহুল্য, খোকাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'ইনি আবার কোত্থেকে আমদানি হলেন ? গিরিডি শহরে তো এনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না !'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও আমার কাছে এসে কিছুদিন রয়েছে। এক জ্ঞাতির ছেলে।'

অবিনাশবাবু বাচ্চাদের আদর করার মতো করে তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে খোকার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, 'কী নাম তোমার খোকা, অ্যাঁ ?'

খোকা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এক্টোমরফিক সেরিব্রেটনিক।'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে দুচোখ বড় বড় করে বললেন, 'ও বাবা এ কোন দিশি নাম, ও অধ্যাপকমশাই !'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওটা ওর নাম নয় অবিনাশবাবু, ও যেটা বলল সেটা হচ্ছে আপনার বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। ওর নাম আসলে, অমূল্যকুমার বসু, ডাকনাম খোকা।'

'বৈজ্ঞানিক নাম ?' অবিনাশবাবু দেখলাম বেশ অবাক হয়েছেন। 'আপনি আজকাল কচি খোকাদের ধরে ধরে ওই সব শেখাচ্ছেন নাকি ?'

এ কথার উত্তরে হয়তো আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু আমার বদলে খোকাই মন্তব্য করে বসল।

'উনি আমায় কিছুই শেখাননি।'

এই বলেই খোকা চুপ করে গেল।

এরপরেই অবিনাশবাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চা কফি কিচ্ছু না খেয়ে উঠে পড়লেন। যে রকম ভাব নিয়ে গেলেন, তাতে আমার ভয় হচ্ছে উনি খোকার কথাটা না রটিয়ে ছাড়বেন না। তেমন উৎপাত আরম্ভ হলে বাড়িতে পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত করব। এখানকার ইন্‌সপেক্টর সমাদ্দারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর

খোকার বিচিত্র কাহিনীর যে এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে তা ভাবতেই পারিনি। গত দু'দিন এক মুহূর্ত ডায়রি লেখার ফুরসত পাইনি। কী ঝক্কি যে গেছে আমার উপর দিয়ে সেটা একমাত্র আমিই জানি। কারণটা অবিশ্যি যা ভয় পেয়েছিলাম তাই-ই। সেদিন অবিনাশবাবু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার আগে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খোকার কীর্তির বর্ণনা দেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে। খোকাকে আমি তার দোতলার ঘরেই রেখেছিলাম, এবং সে ঘুমোচ্ছে এই বলে লোক তাড়ানোর মতলব করেছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণই ঘুমোচ্ছে এ কথাটা তো লোকে বিশ্বাস করবে না। রাত আটটা নাগাদ যখন আমার নীচের বৈঠকখানায় রীতিমতো ভিড় জমে গেছে, আর লোকেরা শাসাচ্ছে যে খোকাকে না দেখে সেখান থেকে তারা নড়বে না, তখন বাধ্য হয়েই খোকাকে নিয়ে আসতে হল। আর অমনি সকলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কী। আমি যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে বললাম, 'দেখুন—মাত্র সাড়ে চার বছরের ছেলে। আপনারা যদি এভাবে ভিড় করেন তা হলে তো আলোবাতাস বন্ধ হয়ে এমনিতেই তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

তখন তারা বলল, 'তা হলে ওকে বাইরে আপনার বাগানে নিয়ে আসুন না।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। খোকাও বাগানে আসেনি কখনও—এসেই তার মুখে কথা ফুটল। সে ঘাস থেকে আরম্ভ করে যত ফুল-ফল গাছ পাতা ঝোপ ঝাড় বাগানে রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ল্যাটিন নাম আউড়ে যেতে লাগল। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার এখানকার মিশনারি ইস্কুলের হেডমাস্টার ফাদার গলওয়ে ছিলেন। তিনি আবার বটানিস্ট। খোকার জ্ঞানের বহর দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে আমার বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই তো গেল পরশুর কথা। কাল আমার বাড়িতে কত লোক এসেছিল সেটা খোকা নিজেই রাত্রে বিছানায় শোবার সময় বলল। তার কথায় জানলাম, লোকের হিসেব হচ্ছে—সবসুদ্ধ তিনশ' ছাপান্ন জন, তার মধ্যে তিন জন সাহেব, সাতজন উড়িয়া, পাঁচজন আসামি, একজন জাপানি, ছাপান্নজন বিহারি, দুজন মাদ্রাজি আর বাকি সব বাঙালি।

গতকাল সকালে কলকাতা থেকে তিনজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির। তারা খোকার সঙ্গে কথা না বলে ছাড়বে না। খোকা কথা বলল ঠিকই, কিন্তু তাদের কোনও প্রশ্নের জবাব সে দিল না। কেবল তিনজনকে আলাদা করে, তাদের কাগজে কত ছাপার কালি খরচ হয়, ক' লাইন খবর তাতে থাকে আর কত সংখ্যা কাগজ ছাপা হয়—এই সমস্ত হিসেব তাদের দিয়ে দিল।

একজন রিপোর্টারের সঙ্গে একটি ফটোগ্রাফার এসেছিল, সে এক সময় ফ্ল্যাশ ক্যামেরা দিয়ে খোকার একটি ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। খোকা বলল, 'ফ্ল্যাশ না। চোখে লাগে।'

ফটোগ্রাফার একটু হেসে খোকা খোকা গলা করে বলল, 'একটা ছবি খোকাবাবু। দেখো না কেমন সুন্দর ছবি হবে তোমার।'

এই বলে তুলতে গিয়ে দেখে কিছুতেই আর ফ্ল্যাশ জ্বলে না—অথচ বাল্‌বটা ঠিকই পুড়ে যাচ্ছে। এই করে সাতখানা বাল্‌ব পুড়ল—কিন্তু ফ্ল্যাশ আর জ্বলল না।

বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন যিনি সমীরণ চৌধুরী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। কলকাতা থেকে আসছেন। বললাম, 'কী প্রয়োজন আপনার?'

ভদ্রলোক বললেন, তিনি নাকি একজন ইম্প্রেসারিও। অর্থাৎ বড় বড় নাচিয়ে বাজিয়ে

গাইয়ে ম্যাজিশিয়ান ইত্যাদির শো-এর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর ইচ্ছে খোকাকে তিনি কলকাতার নিউ এম্পায়ার স্টেজে উপস্থিত করবেন। খোকা সেখানে প্রশ্নের জবাব দিয়ে, মন থেকে অঙ্ক কষে, ল্যাটিন আউড়ে, গান গেয়ে লোককে অবাক করে দেবে! এ থেকে খোকার খ্যাতিও হবে, রোজগারও হবে। তেমন বুঝলে বিলেতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

আমি বললাম, 'খোকার মা বাবার অনুমতি ছাড়া আমি এ ব্যাপারে মত দিতে পারি না! ওর বাবার ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।'

সন্ধ্যার দিকে পাঁচ ছশো লোকের সামনে বসে নানারকম আশ্চর্য কথা বলার পর খোকা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'মির ইস্ট মুয়েডা।'

আমার ভাষা অনেকগুলোই জানা আছে—জার্মানটা রীতিমতো সড়গড়। বুঝলাম খোকা জার্মানে বলছে—'আমি ক্লান্ত।'

আমি তৎক্ষণাৎ সমবেত লোকদের বললাম যে খোকা এখন ভেতরে যাবে, সে বিশ্রাম করতে চায়। লোকেরা হয়তো এ কথায় একটু গোলমাল করতে পারত, কিন্তু পুলিশ থাকায় ব্যাপারটা বেশ সহজেই ম্যানেজড্ হয়ে গেল।

খোকাকে আমার ঘরেই শোওয়ালাম।

প্রায় যখন বারোটা বাজে, তখন দেখে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাতের বইটা রেখে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। আমার মনটা ভাল ছিল না। আমি নিজে নির্জনতা ভালবাসি। গত দু-দিন ভিড়ের ঠেলায় আমারও ক্লান্ত লাগছিল, যদিও ক্লান্তি জিনিসটা আমার সহজে আসে না। চার দিন চার রাত্রি না ঘুমিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে, এবং কোনওবারই কাবু হইনি! আসলে কাল খোকার ক্লান্তির আভাস পেয়েই আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কী উপায় হবে এই আশ্চর্য খোকার? তার মা বাবার কাছে যদি তাকে ফেরত দিয়ে আসি, তা হলেই বা সে রেহাই পাবে কী করে? সেখানেও তো উৎপাত শুরু হবে। এর একটা ব্যবস্থা করব বলে তো আমি নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। তার এমনও নয় যে অন্য কোনও একটা বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিলেই একটা উপায় হয়। ব্রেনে কী কী জাতীয় গোলমাল হতে পারে না পারে সেই নিয়ে আগেই আমার অনেক পড়াশুনা ছিল। তা ছাড়া গত কদিনে আমি একমাত্র এই বিষয়টা নিয়েই এগারোখানা বই পড়ে ফেলেছি। কোনওখানেই খোকার যেটা হয়েছে সে জাতীয় ঘটনার কোনও উল্লেখ পাইনি। পৃথিবীর ইতিহাসে খোকার এ ঘটনা একেবারে অনন্য ও অভূতপূর্ব এ বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই!

এইসব ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই! ঘুমটা ভাঙল হঠাৎ একটা বাজ পড়ার শব্দে। উঠে দেখি ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন। এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় পাশের বিছানার দিকে চেয়ে দেখি—খোকা নেই!

আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। কী জানি কী মনে হল—আমার বালিশটা তুলে দেখি, তার তলা থেকে আমার চাবির গোছাটাও উধাও। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে ল্যাবরেটরির দিকে গিয়ে দেখি—দরজা হাঁ করে খোলা, আর ভিতরে বাতি জ্বলছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে এল।

খোকা আমার কাজের টেবিলের সামনে টুলের উপর বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর সার করে সাজানো আমার বিষাক্ত, মারাত্মক অ্যাসিডের সব বোতল। বুনসেন

বার্নারটাও জ্বলছে, আর তার পাশেই ফ্লাস্কে কী যেন একটা তরল পদার্থ সবেমাত্র গরম করা হয়েছে। খোকার হাতে এখন টিয়্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতল।

সেটা কাত করে তার থেকে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড সে ফ্লাস্কটার মধ্যে ঢেলে দিতেই তার থেকে ভক ভক করে হলদে রঙের ধোঁয়া বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে, যাতে আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল।

এবার, আমি ঘরে ঢুকেছি বুঝতে পেরে খোকা আমার দিকে ফিরে চাইল।

'অ্যানাইহিলিন কোথায় ?' খোকা গর্জন করে উঠল।

অ্যানাইহিলিন ? খোকা আমার অ্যানাইহিলিন চাইছে ? তার মতো সাংঘাতিক অ্যাসিড তো আর নেই। ও অ্যাসিড দিয়ে খোকা করবে কী ? ওটা তো আমার আলমারির উপরের তাকে বন্ধ থাকে। কিন্তু যেসব জিনিস খোকা এতক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাতেও প্রায় খানত্রিশেক হাতিকে অনায়াসে ঘায়েল করা চলে !

আবার আদেশ এল—'অ্যানাইহিলিন দাও। দরকার ! এক্ষুনি।'

আমি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে খোকার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খোকা, তুমি যে সব জিনিস্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ, সেগুলো ভাল না। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবে, ব্যথা পাবে। তুমি আমার সঙ্গে ওপরে ফিরে চলো, এসো।'

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে গেছি, এমন সময় খোকা হঠাৎ টিয়্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতলটা হাতে নিয়ে এমনভাবে সেটাকে তুলে ধরল, যে আর এক পা যদি এগোই আমি তা হলেই যেন সে সেটা আমার দিকে ছুড়ে মারবে। আর তা হলেই—মৃত্যু না হলেও—আমি যে চিরকালের মতো পুড়ে পঙ্গু হয়ে যাব সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই।

খোকা অ্যাসিডের বোতলটা আমার দিকে তাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলল, 'অ্যানাইহিলিন দাও—ভাল চাও তো দাও।'

এ অবস্থা থেকে আর বেরোবার কোনও উপায় নেই দেখে—এবং এত অ্যাসিড হ্যান্ডল করেও খোকা জখম হয়নি দেখে একটা ভরসা পেয়ে আমি আলমারিটা খুলে একেবারে ওপরের তাকের পিছন থেকে অ্যানাইহিলিনের বোতলটা বার করে খোকার সামনে রেখে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম যে অ্যাসিডের বোতলটা খুলে তার থেকে অত্যন্ত সাবধানে ঠিক তিন ফোঁটা অ্যাসিড খোকা তার সামনের ফ্লাস্কটায় ঢালল। তারপর আমি কিছু করতে পারবার আগেই অবাক হয়ে দেখলাম যে খোকা তার নিজের তৈরি সবুজ রঙের মিক্‌সচার ঢক ঢক করে চার ঢোকে গিলে ফেলল। আর পর মুহূর্তেই তার শরীরটা টেবিলের উপর কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা দোতলায় তার খাটে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। তার নাড়ি আর বুক পরীক্ষা করে দেখলাম—কোনও গোলমাল নেই, ঠিক চলছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও ঠিক চলছে, মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন নেই, বরং বেশ শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অজ্ঞান যে হয়েছে, তাও মনে হল না। ভাবটা ঘুমের—গভীর ঘুমের।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আমিও চুপ করে খোকার খাটের পাশে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থেমে মেঘ কেটে যেতে দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। কাক চড়ুই ডাকতে শুরু করেছে।

ঠিক ছটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় খোকা একটু এপাশ ওপাশ করে চোখ মেলে চাইল।

তার চাহনিতে কেমন যেন একটা নতুন ভাব। একটুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করে খোকা বলল, 'মা কোথায় ? মা'র কাছে যাব।'

*　　*　　*

আধ ঘণ্টা হল খোকাকে ঝাঝায় তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ঝাঝা যাবার পথে গাড়িতেই খোকার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। যখন চলে আসছি, তখন সে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'আমায় লজঞ্চুস এনে দেবে দাদু,

লজঞ্চুস ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেব। কালই আবার গিরিডি থেকে এসে তোমায় লজঞ্চুস দিয়ে যাব।'

মনে মনে বললাম, খোকাবাবু, একদিন আগে হলেও তুমি আর লজঞ্চুস চাইতে না—তুমি চাইতে দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম-ওয়ালা কোনও এক বিচিত্র, বিজাতীয় বস্তু।

সন্দেশ। আষাঢ় ১৩৭৪